[illegible]

[illegible]

এই শহরে আগে আসেনি সুনীল। সুনীল চন্দ্রোথ। বরাবর কোচিতে থাকে। আজন্ম। কিন্তু এ শহরের সঙ্গে ওর একটা গভীর যোগ আছে। ওর বাবা একবার এখানে এখানে আত্মগোপন করে ছিলেন। মিস্টার কেশবনের বাড়িতে, ভবানীপুরে রূপচাঁদ মিত্র লেন। এইটুকু সম্বল করে সুনীল যখন নেতাজী সুভাষ এয়ারপোর্টে নামল তখনো ভালো করে বিকেল হয়নি। ১০. ৪৫- এ কোচি থেকে ছেড়ে মোটের ওপর ঠিকঠাক এসেছে বলা যায়। লাগেজ টাগেজ কালেক্ট করে মালিনীকে একটা ফোন করল সুনীল। ফোনটা বেজে গেল। হয়তো মিটিং -এ আছে। সে একটা এস. এম. এস. করে দিল 'রিচড কলকাতা সেফলি'। মালিনী বেশিরভাগ সময় মোবাইল ডেটা অফ করে রাখে, তাই হোয়াটসঅ্যাপ করলে নাও দেখতে পারে। মেসেজটা পাঠানর পর একটা কফি নিয়ে ধীরেসুস্থে চুমুক দিল । চারটে এখনও বাজেনি। ওর হাতে অনেক সময়। সুজাতা ছটার আগে আসবে না। ওর স্কুল ছুটি হয় সোয়া পাঁচটা, সেখান থেকে একটা অটোতে ও চলে আসবে অ্যাক্রোপলিস মলে, সেখান থেকে ও সুনীলকে নিয়ে যাবে একটা গেস্ট হাউসে। সুনীল জিগ্যেস করেছিল, 'সোজাই তো গেস্ট হাউস চলে যেতে পারি আমরা। আবার মল কেন?' আসলে এসব মল-টল তার একটুও ভালো লাগে না। তার ভালো লাগে ছোট ছোট দোকান, জীবন্ত মুখ চোখের দোকানী, যারা রাতের দিকে দোকান ফাঁকা থাকলে জীবনের সব কাহিনি উজাড় করে দেয়। ছাপাখানার মালিক কেশবনের এরকম কাহিনি ছিল? কে জানে?

সুজাতা উত্তরে বলেছিল, 'একবার বসেই দেখো। এই সব মলে খুব নিজের মতো স্পেস পাওয়া যায়। তোমার ভালো লাগবে। আর গেস্ট হাউসটা এমনি ভালো, তুমি যে জায়গাটায় যেতে চাইছ, তার খুব কাছে, কিন্তু ঘর তো একটাই, বসে কথা বলার…' বলতে বলতে থমকে গেছিল সুজাতা। সুনীল বুঝে নিয়েছিল যা বোঝার। গেস্ট হাউসের বন্ধ ঘরে সুনীলের সঙ্গে বসতে ভয় পাচ্ছে সুজাতা। ওর প্রথমে খুব অপমানিত লেগেছিল। ভেবেছিল বলে, মলেও আসার দরকার নেই,ও একটা ক্যাব ধরে সোজা গেস্ট হাউস চলে যেতে পারবে। কিন্তু সেটা খুব অভদ্রতা হত। সুজাতাই সব ঠিক করেছে। ওর স্কুল, সংসার, তিন বছরের ছোট মেয়ে, ক্যান্সার পেশেন্ট বাবা –সমস্ত সামলিয়ে। এর পরে কি বলা যায়- এসো না তুমি, আমি একাই ঠিক আছি? আর ঘটনা হচ্ছে, গেস্টহাউস বা মল দুটোই ওর সমান অচেনা, তবু যদি খানিকটা রাস্তা সুজাতা সঙ্গে থাকে। সুনীল ভাবল সুজাতাকে একটা ফোন করে নেয়। তার আগেই ফোন বাজল। সুজাতা করছে নাকি? না, মালিনী।

'পৌঁছে গেছ?'

‘হ্যাঁ এবার গেস্ট হাউসে যাব’

‘আচ্ছা শোন, তোমার মা দুপুরে ফোন করে জানতে চাইছিলেন তুমি কোথায় গেছ? তোমাকে জিগ্যেস করতে তুমি নাকি কিছু উত্তর দাওনি’

‘বলে দিও ব্যাঙ্গালোর গেছি। এটা নিয়ে এত মাতামাতির কি আছে?’

‘ব্যাঙ্গালোর তো টু উইকস আগেই গেলে। আবার বললেই সন্দেহ করবেন’

‘তাহলে পুণে বল, কিংবা উটি কিংবা কাশ্মীর। দোহাই কলকাতা বোলো না’

‘মা জানেন তুমি কলকাতা গেছ।’ কেটে কেটে বলে মালিনী।

ধাঁ করে মাথা গরম হয়ে যায় সুনীলের ‘ মা কী করে জানল? নিশ্চয় তুমি বলেছ?’ ওপারে মালিনী চিৎকার করে ওঠে ‘আমি বলব কেন ? তুমি ঐ মেয়েটার সঙ্গে, দ্যাট হোর, এই কদিন জোরে জোরে কথা বলেছ, মা কি কালা?’

বলেই খট করে ফোন কেটে দিল মালিনী। সুনীলের কান ঝাঁঝাঁ করছিল। কী বলল মালিনী? সুজাতা হোর!

কীসের ভিত্তিতে এতবড় অপবাদ দিতে পারল মালিনী, সেটা ভেবে পেল না সুনীল। সুজাতাকে ও কতটুকু জানে? মাস কয়েক কোচিতে গিয়ে ছিল সুজাতা। কোন একটা প্রজেক্টের কাজে। তখনো স্কুলটায় জয়েন করেনি। একটা রিসার্চ গ্রুপে ছিল। তখনি সুনীলের সঙ্গে আলাপ। মালিনী অবশ্য তখন থেকেই ওর ওপর খাপ্পা। কারণ ছ মাসের মেয়েকে মায়ের কাছে ফেলে ও কোচিতে এসে ছিল। এ ব্যাপারটা একদম মেনে নিতে পারেনা মালিনী। অনেকবারই বলেছে সে কথা ‘ কীরকম মা রে বাবা? দুধের শিশু ফেলে কাজ করতে এসেছে! তাও চাকরি নয়, প্রোজেক্ট!’ মালিনীর চোখে তাই সুজাতা যে একটু কম মা, সেটা জানত সুনীল। কিন্তু তাই বলে হোর? এটা কি মেয়েলি জেলাসি? অথচ মালিনী খুব ভালভাবেই জানে সুজাতার সঙ্গে সুনীলের কিছু নেই, ও কলকাতায় চলে এসেছে বছর দুয়েকের বেশি। এর মধ্যে মাঝে মাঝে হোয়াটস্যাপ ছাড়া আর কোনরকম যোগাযোগই ছিল না। হঠাত বশীর আঙ্কলের ফোনটাই সব এলোমেলো করে দিল। কলকাতা আসা জরুরি হয়ে পড়ল তার। আর কলকাতা বলতে একমাত্র সুজাতাকেই তো চেনে। আর সুজাতা বলেছিল না ওরা ছোটবেলায় ভবানীপুরে থাকত? সেটা মনে পড়তেই ফোন করেছিল সুজাতাকে। সুজাতাই সব ব্যবস্থা করেছে। আপাতত দিন তিনেক থাকার কথা। দরকার হলে সেটা আরও বাড়বে। তবে সাতদিনের বেশি সম্ভব না। হয়তো আবার আসতে হবে, হয়তো বারবার আসতে হবে, যতদিন না...

সুনীলের ক্যাব এসে গেছিল।

২

সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল সুজাতা। ও আরও সুন্দরী হয়েছে। সুনীল ভেবে পেল না কী করে এত সুন্দরী হল সুজাতা? তিন বছরের মেয়ের ঝক্কি তো কম না। তার ওপর বাবার ক্যানসার, তাঁকে নিয়ে ছোটাছুটি, এত কিছু করে ওকে তো ম্লান নিষ্প্রভ দেখানোর কথা। কিন্তু তার বদলে সুনীল দেখল ঝলমলে অনেক কমবয়সী একটি মেয়েকে। এ যেন সেই সুজাতা নয়, অন্য কেউ। ডিভোর্স পেয়ে যাওয়ার কথা হোয়াটসঅ্যাপেই জানিয়েছিল। বিয়েটা একদম ভাল হয়নি ওর। চার বছরের দাম্পত্যের প্রতিটা দিনই ছিল কণ্টকিত। সেই অসুখী সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেই কি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ও? নাকি কারো প্রেমে পড়েছে? ভাবতেই, কি অদ্ভুত, হঠাৎ মন খারাপ হয়ে গেল সুনীলের। ও বুঝতেই পারল না সুজাতা কারো প্রেমে পড়লে ওর মন খারাপের কী আছে?

কে হয় সুজাতা তার?

বেশ কয়েক বছর আগে গোয়াতে আলাপ তাদের। সুনীল তখন একটা লিডিং ডেইলির ফিল্ম ক্রিটিক। ফেস্টিভাল কভার করতে গিয়েছিল গোয়ায়, আর সুজাতা ওর বানানো একটা শর্ট ফিল্ম নিয়ে। শিশুদের কল্পনার জগত নিয়ে চমৎকার বানিয়েছিল ছবিটা। শেষ দৃশ্যটা এখনও মনে আছে । বাচ্চাটা উপুড় হয়ে ছবি আঁকছে। মা বলেছে একটা সার্কল আঁকতে।

কিন্তু আঁকতে গিয়ে পেন্সিল ভেঙ্গে গেল, বৃত্ত আঁকা আর হল না, অসমাপ্ত কার্ভেচার আস্তে আস্তে ব্যপ্ত আকাশ হয়ে গেল, সেখানে একটা ঘুড়ি আপন মনে উড়ছে। ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা গান বাজছিল, টেগোর সং। কী যেন… ‘আমার মুক্তি আলোয় আলোয়’… সাবটাইটেল ছিল, তাও পরে ডিরেক্টরের কাছ থেকে মানেটা জেনে নিয়েছিল সুনীল। বলেছিল, ছোটবেলায় টেগোর সং শুনেছে সে অনেক। সুজাতা রোদ চশমাটা মাথার ওপর তুলে অবাক চোখে তাকিয়ে বলেছিল ‘কীভাবে?’

‘বাবা কয়েকমাস কলকাতায় ছিলেন, আসার সময় কয়েকটা ক্যাসেট এনেছিলেন’

গোয়ার সৈকত, নবীন পরিচালক, নবীন সমালোচক, প্রেম হওয়াই তো স্বাভাবিক ছিল। হয়নি। ওদের দুজনেরই স্টেডি রিলেশন ছিল। তাদের সঙ্গেই বিয়ে হয় ওদের। সুজাতার বিয়েটা টিকল না। তা আর কী করা যাবে? আর বিয়ে টিকে থাকলেই কি ধরে নিতে হবে সব ঠিকঠাক আছে? এই যে মালিনী আর সে… আসলে বিয়ে টেকাতে ভালবাসা নয়, অন্য কিছু মেকানিজম লাগে, তা হয়তো সুজাতার বেলায় কাজ করেনি।

সুজাতা এগিয়ে এসে ওর বাহু আলতো করে ছুঁয়ে বলল ‘ কী এত ভাবছ? দুদিন ও বউকে ছেড়ে থাকতে পারছ না?’

সুনীল শব্দ করে হেসে ওঠে আর সেই হাসিতে ওদের মাঝখানের আড়াই বছর উড়ে যায়।

৩

কিছুক্ষণ পরে কফির কাপে চিনি নাড়তে নাড়তে সুজাতা জিজ্ঞেস করল

‘তুমি ঠিক কী জন্যে এসেছ সুনীল কলকাতায়?

সুনীল একটু চমকাল। সুজাতার সঙ্গে তো এ নিয়ে বিশদেই কথা হয়েছে। তবু..

সুনীল কেটে কেটে বলে ‘ আমার বাবা অরবিন্দ চন্দ্রোথ, খুব একটা রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে কেরল ছাড়েন। তখনো মার সঙ্গে বিয়ে হয়নি। তিনি চলে আসেন সোজা কলকাতায়। এখানে মিস্টার কেশবন বলে একজনের বাড়িতে আত্মগোপন করে থাকতেন। কেশবনের ছিল একটা প্রেস। সেই প্রেসে কমার্শিয়াল কাজ হত, পাশাপাশি অনেক পলিটিকাল লিফলেট ছাপা হত, বাবা সেইগুলো দেখাশোনা করতেন। আর প্রেসের কাজও অনেকটাই শিখে গিয়েছিলেন। সব থিতিয়ে যেতে বাবা যখন কেরলে ফিরলেন তখন তাঁর সঙ্গে ছিল প্রেস খোলার স্বপ্ন আর একটা মেয়ের ছবি’।

‘মেয়ের ছবি? কে সে?’ কফিতে চুমুক দিতে গিয়ে থমকে যায় সুজাতা

‘সেটাই তো প্রশ্ন। বাবা বছর তিন কলকাতায় ছিলেন। সেইসময় কোন বাঙালি মেয়ের প্রেমে পড়া অস্বাভাবিক কিছু নয়, তার ছবি সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে সেইটাই মনে হয়। আর এখানেই মার সঙ্গে গণ্ডগোলের শুরু। যখনি বাবা টেগোর সং গুলো শুনতেন মা একবারে খেপে যেতেন।‘

‘ছবিটা তুমি দেখেছ? ‘

‘সেটাই আশ্চর্য। ছবিটা বাবার ডায়েরির খাপে থাকত, বিশেষ কোথাও লুকিয়ে রাখেননি, যে কেউ দেখতে পারত। তবে গত বছর বাবা মারা যাবার পর ডায়েরি বা ছবিটা খুঁজে পাইনি। মনে হয় মা সরিয়ে ফেলেছেন।’

সুজাতার মুখে স্পষ্ট হতাশা ফুটে উঠল। সে কি ভেবেছিল ছবিটা সুনীল পকেটে করে নিয়ে এসেছে তাকে দেখাবে বলে আর দেখলেই সে বলে উঠবে ‘ওমা একে তো আমি চিনি!’বেশ একটা থ্রিলারের গন্ধ তাকে উত্তেজিত করে তুলেছিল। সুনীল মোবাইল বাড়িয়ে বলল ‘দেখো।’

সুজাতা দেখল সুনীলের মোবাইলের ফোটো গ্যালারিতে একটা সাদা কালো ছবি। ষাটের দশকের ছাপ স্পষ্ট মেয়েটির সাজে। লম্বা বিনুনি, ডুরে তাঁতের শাড়িতে লাবণ্যময়ী বাঙ্গালিনী। অরবিন্দ এর প্রেমে পড়েছিলেন? সুনীল আরেকটা ছবি দেখিয়ে বলল ‘এটা ছবির পেছনটা। বাংলাটা পড়ে বলো’।

সুজাতা পড়ল ‘ মনে রবে কিনা রবে আমারে সে আমার মনে নাই নাই’ -বৈশাখী।

সে উচ্চারণ করে পড়ল, তারপর বলল, ‘এটা একটা টেগোর সং। মানেটা বুঝিয়ে বলছি তোমাকে। আচ্ছা, তুমি কি এই বৈশাখীকে খুঁজতে এসেছ?’

সুনীল দুদিকে মাথা নেড়ে বলল ‘সেরকম এলেও ক্ষতি কী ছিল? তুমি ভাবো এই মহিলা আমার মায়ের মতই, আমার জন্ম থেকে আমাদের সঙ্গে রয়ে গেলেন, একটা অচেনা লিপির মতই রহস্য , নাহ, সুজাতা আমি আসলে বশীর কাকার মুখে শুনলাম, বাবার মতো কেউ কেউ সেসময় কেশবনের বাড়ি আত্মগোপন করে ছিলেন, তাঁদের স্মৃতি নিয়ে একটা ছবি হবে, তখন তো বাবা সবার প্রপার্টি হয়ে যাবেন, তাই ভাবলাম…’

সুজাতা একটু হতাশ গলায় বলল ‘কিন্তু সে কি কিছু পাওয়া যাবে? কেশবনের বাড়ি, সবাই যেটাকে ম্যাড্রাস হাউস বলত, সেটা অনেক টাকায় প্রোমোটারকে বেচে, প্রেসটাও বেচে বাইপাসে ফ্ল্যাট কিনে চলে গেছে ওর ছেলে। প্রেস, কমিউনিজম, সাহিত্য কোনটাই তার কাপ অব কফি নয়। সেই ঠিকানা আমি যোগাড় করে দিতে পারি, কিন্তু লাভ নেই’।

সুনীলের রাগ হয়ে গেল শুনে। এসব নিশ্চয় সুজাতা আজ জানেনি, সুনীলকে কলকাতায় টেনে এনে এসব শোনানোর মানে কি? ও বহুকষ্টে নিজেকে সামলে শুখনো গলায় বলল ‘তাহলে সত্যি আমি কেন এলাম সুজাতা?’

সুজাতা উত্তর না দিয়ে রহস্যময় হাসি হেসে ওর মুখে স্থির চোখে তাকাল। সুনীল দেখল, সুজাতার কালো গভীর চোখের আড়ালে কী যেন একটা আত্মগোপন করে আছে, ও ধরতে পারছে না।